E-CONTENT PREPARED BY

Dr. Shreya Ray

Assistant Professor

Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Programme (Semester- I) in Bengali

Name of Course: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (কথাসাহিত্য)

Topic of the E-Content:
ইকোক্রিটিসিজমের তত্ত্বালোকে বিভূতিভূষণের উপন্যাস

ইকোক্রিটিসিজমের তত্ত্বালোকে বিভূতিভূষণের উপন্যাস

উদ্দেশ্য:-

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রকৃতি মা রূপে পূজিত হয়ে আসছে। প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করলেও দেখা যায় পরিবেশ চেতনায় সেই সব সাহিত্য ভরপুর। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষের অস্বাভাবিক লোভ,ক্ষমতার আস্ফালন পরিবেশকে ক্রমশ 'যক্ষপুরী' করে তুলতে প্রয়াসী। সেখানে প্রকৃতির কোলে জাত নন্দিনীর একান্তভাবে প্রয়োজন রয়েছে। তার জন্ম হতে পারে তখনই যখন বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি প্রকৃতি-পরিবেশ চেতনার বোধ মানুষের মধ্যে জাগরিত হবে। যেহেতু সাহিত্য মানুষের ভেতরে সুপ্ত রসের জাগরণ ঘটাতে সক্ষম, তাই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই প্রকৃতি-পরিবেশ চেতনার বোধ জাগরিত হওয়া সম্ভব। এই কারণে সাহিত্যকে ইকোক্রিটিসিজম বা সবুজ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ইকোক্রিটিসিজম:-

সবুজ সমালোচনা বা ইকোক্রিটিসিজম হলো এক বৃহত্তর প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও সাহিত্যের গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের আলোচনা। পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত উপাদান যেমন – জল, মাটি, বায়ু, আগুন ইত্যাদি যখন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ রক্ষার তাগিদ নিবিড় ভাবে আলোচিত হয় তাকে সবুজ সমালোচনা বলে।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাচেল কারসন ’সাইলেন্ট স্প্রিং’-এ ডি.ডি.টি– এর ব্যবহারের ফলে নীরব বসন্তের যে ভয়ঙ্কর রূপ তুলে ধরেন তাতে মানুষ সচেতন হয় এবং পরবর্তী সময়ে ক্রমশ তা থেকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিলে সবুজ বাঁচাও আন্দোলনের ছোঁয়া বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। সেইসময় ইকোক্রিটিসিজম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইকোলজি শব্দটি মানুষের পরিবেশ সচেতনতা মধ্য দিয়ে এক শাস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান চর্চার শাখা হিসেবে জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল ইকোলজি কে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ইকোলজি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ‘ঐকোস’ থেকে, যার অর্থ বাড়ি। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এর ভাষায়, **"এই বাড়িটা কার ? সর্ব মানুষের। ভাবাসঙ্গে জেগে ওঠে ‘ ঈকোমেনে ’ শব্দটি , যার তাৎপর্য ‘ যাপিত পৃথ্বীলোক ’ মনে হয় সংস্কৃত ‘ ঐক্য ’ শব্দটিও এর সদৃশ।"** অর্থাৎ শুধু নিজে বাঁচা নয়, নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও— একসঙ্গে সকলে সুন্দরভাবে বাঁচো এই সুর ইকোলজির মূল সুর।

ইকোক্রিটিসিজম এর সঙ্গে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে যেমন-

ডিপ ইকোলজি:- পরিবেশ সচেতনতা বা পরিবেশ রক্ষার বাহ্যিক দায়িত্ববোধ কে গাছ লাগানো ইত্যাদি অতিক্রম করে এই দর্শন চাই মানুষের মূল্যবোধের জাগরণ ঘটিয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলতে এবং পরিবেশ চেতনাকে মানুষের জীবন চর্চার অন্তর্ভুক্ত করা এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

গ্রিন কেমিস্ট্রি বা সবুজ রসায়ন :-

এমন একধরনের রসায়ন চর্চা যেখানে গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার ফলে উৎপাদিত পদার্থ হবে পরিবেশ বান্ধব এবং পরিবেশের ক্ষয় ক্ষতির ঝুঁকি কম থাকবে।

ইকো ফেমিনিজম:-

এই ধারণাতে নারী ও প্রকৃতিকে সমার্থক হিসেবে দেখা হয়। পরিবেশ ও নারী উভয়ই মানুষের সেবা করে অথচ তারাই সেই সেবার যোগ্য মূল্য পাই না। সাহিত্যে নারীকে ও প্রকৃতিকে যখন অভিন্ন সত্তা হিসেবে দেখা হয় তখন তাকে সাহিত্যে ইকো ফেমিনিজম তৈরি হয়। যেমন-

বনফুলের ‘নিমগাছ’ গল্পে দেখানো হয়েছে নিমগাছ ও বধূর কাছে থেকে মানুষ শুধু গ্রহণ করে সব কিছু কিন্তু তাদের কিছু দেওয়ার কথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভাবে না। আবার ‘ছিন্নপত্র’-এর ৪৩ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী ও জলকে একাত্ম করে বলেছেন, জলের মতো নারীও কঠিন ভূমিকে আলিঙ্গন করে থাকে, **‘সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না,কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না।”**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়:-

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। তৎকালীন সময়ের তথাকথিত সাহিত্যের বিষয় থেকে বেরিয়ে গ্রামবাংলার পুরোনো জীবন,সংস্কৃতিকে তিনি তাঁর লেখনীর গুণে অভিনবভাবে তুলে ধরেন। তাঁর ‘পথের পাঁচালী’র সলতেখাগি গাছ শুধু উপন্যাসের উপাদান হয়ে থাকে না। বরং ব্যক্তিগত জীবনেও সেই গাছ আত্মীয় বন্ধু হয়ে থাকে। তাই গাছটি ঝড়ে ভেঙে গেলে লেখক দিনলিপিতে লেখেন ‘’’আপনার নিকট-আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলাম’’(‘পথের কবি, কিশলয় ঠাকুর,পৃ:-২৩৮)। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) *প্রবাসী*পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় *উপেক্ষিতা*নামক গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল- *মেঘমল্লার*(১৯৩১)

1. *মৌরীফুল*(১৯৩২)
2. *যাত্রাবাদল*(১৯৩৪)
3. *জন্ম ও মৃত্যু*(১৯৩৭)[৫]
4. *কিন্নর দল*(১৯৩৮)
5. *বেণীগির ফুলবাড়ি*(১৯৪১)
6. *নবাগত*(১৯৪৪)
7. *তালনবমী*(১৯৪৪)ইত্যাদি।
8. এছাড়াও তারানাথ তান্ত্রিক তাঁর সৃষ্ট অসাধারণ চরিত্র,যা তিনি তাঁর দ্বিতীয় শ্বশুর ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রেগুণে অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করেন। তবে যে সময় তিনি এই চরিত্র সৃষ্টি করেন তখন ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে তিনি চিনতেন না, ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরের কাছে তিনি তাঁর কথা শুনেছিলেন। তাঁর কালজয়ী উপন্যাসগুলি হল- *পথের পাঁচালি*(১৯২৯)

9. *অপরাজিত*(১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩২)

10. *দৃষ্টিপ্রদীপ*(১৯৩৫)

11. *আরণ্যক*(১৯৩৯)

12. *আদর্শ হিন্দু হোটেল*(১৯৪০)

13. *বিপিনের সংসার*(১৯৪১)

14. *দুই বাড়ি*(১৯৪১)

15. *অনুবর্তন*(১৯৪২)

16. *দেবযান*(১৯৪৪ ইত্যাদি।

17.

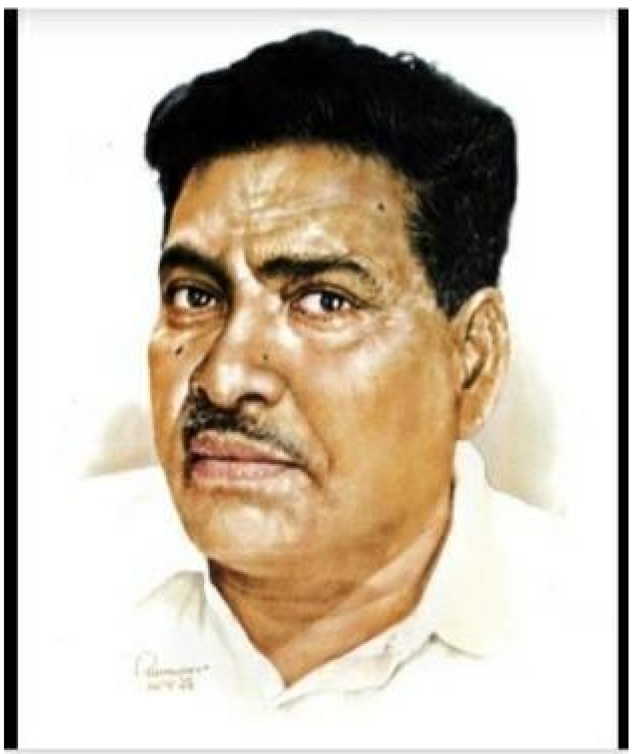

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা:-

বাংলা সাহিত্যে সবুজ সমালোচনার আলোচনার শুরুতেই যে নাম উচ্চারিত হয় তা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোকরঞ্জন দাশের ভাষায়, **“রবীন্দ্রনাথই বোধহয় , ভারতীয় ও ইউরোপীয় সবুজ জাগৃতির প্রেক্ষাপটে ও একমাত্র মানুষ যিনি প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিস্থাপনের ব্যাপারটা বুঝেছিলেন এবং আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন ।”**(সবুজ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা / শেষ কথা কে বলবে ?) ‘বলাই’ ছোটোগল্প, ‘রক্তকরবী’ নাটক, ‘অরণ্যদেবতা’ ইত্যাদি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য ‘রামায়ণ’, কালিদাসের কাব্য ইত্যাদির মধ্যে পরিবেশ চেতনা ভরপুর পরিমাণে রয়েছে।বর্তমানে পরিবেশভাবুকরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশচিন্তাকে । তারা জানিয়েছেন, — **“ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় মানুষ , পশুপাখি , কীটপতঙ্গ , বৃক্ষলতা গুল্ম , পাহাড় , নদী , অরণ্যকে এক অখণ্ড সত্তার প্রকাশ বলে মনে করা হয়েছিল । কী করে বীজের ভিতর থেকে অরণ্য জন্ম নেয় , জলের কথার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল সাগর — এই মহান উপলব্ধি ছিল বলেই** 2প্রকৃতির **প্রতি বৈরিতার বা লুণ্ঠনের মনোভাব আর্যঋষিদের ছিল না । প্রভুত্বের কোনো মনোভাব ছিল না । যা ছিল , তা সহানুভূতির চেয়ে আরও কিছু বেশি — যার নাম সমানভৃতি । এই জীবনাদর্শ সংঘাত সংগ্রাম নয় , বিশ্বপ্রাণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জীবনের প্রতি নম্র হয়ে বাঁচতে শেখায় । "**(প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা, শুভেন্দু গুপ্ত, পৃ: ২৩২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশচিন্তাকে ঐতিহ্যসূত্রেই অর্জন করেছিলেন । ফলে ‘পথের পাঁচালী’,’অপরাজিত’-র অপু , ‘আরণ্যক’-এর সত্যচরণ চরিত্র ভারতীয় পরিবেশচেতনার প্রতিনিধি স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

পথের পাঁচালী:-

লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়নিশ্চিন্দিপুর নামে একটি গ্রামের পরিচয় দিয়েছেন এই উপন্যাসে। সেই পরিচয় দিতে গিয়ে অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির বিন্যাস, ভৌগোলিক তাৎপর্য, সামাজিক ইতিহাসকে অতিক্রম করে তিনি গুরুত্ব দিলেন নদ , ঝোপ ঝাড়, পুকুর , মাঠঘাট, বনজঙ্গল, শস্যক্ষেত্র, পশুপাখি সবকিছুর খুঁটিনাটি বর্ণনায়। তাঁর বর্ননায় নাম না জানা পাখি বা গাছ

বলে কোনো কিছু উপেক্ষিত হয় না। বরং প্রকৃতি পরিবেশে সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশিত হয়।বিভূতিভূষণের গ্রাম যেন শস্য শ্যামল বঙ্গপ্রদেশের যেকোনো গ্রাম। তাঁর পরিবেশভাবনায় ক্ষেত্রে ভৌত, জৈব ও সামাজিক পরিবেশ ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। অপুর পরিবেশ প্রকৃতি নিরপেক্ষ পরিবেশ নয়, বরং প্রকৃতির একাত্মতা তাকে অন্যভাবে পরিবেশকে চিনতে শেখায়। নীল কুঠির মাঠে যে যেন আবিষ্কার করে ইতিহাস ও প্রকৃতির মেলবন্ধনে গঠিত এক শান্তির পরিবেশ। একইসঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্রত কথা এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

পুণ্যিপুকুর ব্রত, সেঁজুতি ব্রত , মাঘী পূর্ণিমাতে পুণ্যস্নান , চড়ক উৎসব, কলুইচণ্ডীর ব্রত প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা আছে । বর্ণনাগুলির মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির আত্যন্তিক সংযোগ ধরা পড়ে। যেমন পুণ্যিপুকুর ব্রতের বর্ণনায়, উঠোনে চৌকোনো গর্ত কেটে ছোলা মটর ছড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ যেমন আছে তেমনি পিটুলি গোলার আলপনায় ফুটিয়ে তোলা পাখি , ধানের শিষ, পদ্মলতা, নতুন ওঠা সূর্য — এসব ছবি একান্তভাবে প্রকৃতিলগ্ন সংস্কৃতিকে ধারণ করে রেখেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতি ফুটে ওঠে বিভিন্ন সংযুক্ত বহু ছড়াগানে। এই ছড়াগানগুলিও প্রকৃতিনির্ভর সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। যেমন-

১."পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পুজে রে দুপুর বেলা ?

আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন ভাগ্যবতী—"

২."হলুদ বনে বনে—

নাক ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—"

অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক এই উপন্যাসে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ইকোক্রিটিসিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমনকি প্রকৃতির বর্ণনায় জীব বৈচিত্র্য, সালোকসংশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ও রয়েছে।

‘পথের পাঁচালী’-র ‘অঙ্কুর সংবাদ’ পর্বে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম থেকে কাহিনি কাশীর পটভূমিতে স্থাপিত হয়।এই পর্বের কাহিনিতে দুর্গা অনুপস্থিত। অপু ও দুর্গা ছাড়া পটভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম্য প্রকৃতিকে যেভাবে বিভূতিভূষণ আগের দুটি পর্বে ব্যবহার করেছিলেন তার সুযোগ আর এখানে থাকে না। ফলে এই পর্ব থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বিচ্ছিন্ন জীবনকথা লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু শিশু থেকে ক্রমশ কিশোর হয়ে ওঠা অপু নিশ্চিন্দিপুরে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছিল তা তার মনে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায় ।এইজন্য কাশী বসবাসকালে অপুর পরিবেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা উপন্যাসটিতে প্রকাশ লাভ করেছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় অপু নিশ্চিন্দিপুরে ফিরতেও চেয়েছে। অবশ্য পথের দেবতা তাকে এগিয়ে চলার মন্ত্র শোনায়, পথের কবির নিজের ভাষায়, "গতিই জীবন, গতির দৈনই মৃত্যু।"(কিশলয় ঠাকুর, 'পথের কবি', ষষ্ঠ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স,১৯৭৮, পৃ: ২২৮), ঘরছাড়া হবার জন্য আহ্বান করে। কিন্তু বাস্তবে নিশ্চিন্দিপুর তার মনে 'ঘর' সম্পর্কিত ভাবনাটিকে

আগ করতে দেয় না। ইকোলজি শব্দটি গ্রিক শব্দ 'ইকোস' (Oikos) এবং 'লোগোস' (Logos) সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ।এই 'ইকোস' শব্দটির অর্থ হল ঘর বা হোম। ইকোলজির ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতি হল সেই ঘর। ফলে এই উপন্যাসে অপুর মনের মধ্যে ঘর রূপে থেকে গেল সেটি নিশ্চিন্দিপুর ও তার ভৌত পরিবেশ। ফলে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির শেষে অপুর কাহিনি নিশ্চিন্দিপুরের বাস্তব পটভূমি বিচ্ছিন্ন হলেও , পরিবেশ বিছিন্ন হয় না। অপুর মানস পটভূমি নিশ্চিন্দিপুর হয়েই থাকে।

অপরাজিত:-

'পথের পাঁচালী'-তে মানব জগৎ যেন (Human world) ছোটো এবং মানব - নিরপেক্ষ জগতের (Non human world)অধিক বিস্তার দেখা যায়। অন্যদিকে 'অপরাজিত' উপন্যাসে মানবসমাজের জটিলতার পরিচয় প্রদানে লেখকের অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অপু চরিত্রটির মনের গঠনটি নিশ্চিন্দিপুরেই এমনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে ভিন্নতর পটভূমিতে থেকেও পরিবেশচেতনা উপন্যাসটিতে উপেক্ষিত হয়নি। 'অক্রুর সংবাদ' পর্বেই পরিবেশ - বিচ্ছিন্ন অপুর মনের যন্ত্রণা রূপ পেতে আরম্ভ করে। কাশীতে তার ভালো লাগে না। শহরের 'ইট সিমেন্টের কাণ্ডকারখানায়' তার প্রাণে মনে হাঁপ ধরে যায় । গাছপালা সে দেখতে পায় না। অন্যদিকে তার নজর এড়ায় না 'দুই বাড়ির মাঝখানের ফাঁকে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ।' পরিবেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় অপু 'অপরাজিত উপন্যাসের মধ্যেও

কাতর হয়েছে স্কুলের বোর্ডিং- এ থাকর সময়। তার মন বোর্ডিং ঘরে আবদ্ধ থাকতে চায় না — 'মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ, গাছপালার জন্য মন কেমন করে।' এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন যে, অপুর মনে উন্মুক্ত পরিবেশের জন্য মন বেশি কাতর হয়ে উঠলে সে মাঠে গাছের নিচে বসে বসে গাছের ও লতাপাতার নাম লেখে এবং যে ধরনের ভূমি সৌন্দর্যের জন্য তার মন উতলা হয় তার একটি কল্পিত বর্ণনা দিয়ে খাতা ভরিয়ে তোলে। বাস্তবে যেখানে অপু পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে সেই পরিবেশ বিচ্ছিন্ন মনকে পরিবেশে সঞ্জীবিত করবার প্রয়াস অপুর চরিত্রে ভিন্ন দিককে প্রস্ফুটিত করে। বিবাহিত অপু কলকাতা শহরে যখন আলো হাওয়াবিহী, শ্রীহীন ভাড়াটে ঘরে বসবাস আরম্ভ করে তখন আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠতে থাকে নগর জীবনের প্রতি তার বিরাগ। বদ্ধ পরিবেশ থেকে সে মুক্তি পেতে চায়।

আসলে অপু প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনকে ভালোবাসতে শিখেছে। তার মনে হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানুষ যে তার প্রয়োজনে গাছপালাকে ধ্বংস করছে তা কোনোদিক থেকেই মঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসবে না। অপুর ভাবনাতে লেখক জানিয়েছেন— "এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায় , অস্ট্রেলিয়ায় , নিউজিল্যাণ্ডে , আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ... সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে; এর শুশুক, পাখি, শিল, বলগা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে — তেল, ব্যবসা চামড়ার লোভে, ওর মহিময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে" — এখানে অপু অত্যন্ত সোজাসুজি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকার গাছপালা ধ্বংসের কথা ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিবেশ বিনষ্টিকে চিহ্নিত করেছে। আবার সভ্যতাদর্পী মানুষ যেভাবে পর্বতমালা, হ্রদে নিজের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তাও অপুকে ব্যথিত করেছে। সভ্যতার আগ্রাসনে মানুষ ভৌগোলিক পরিবেশকে আঘাত করেছে তাও জানিয়েছে অপু। শুশুক , পাখি , শিল , বল্গা , হরিণ ভালুককে হত্যা , যার কারণ তেল ব্যবসা ও চামড়ার লোভে। আবার পাইনগছের বনভূমিকে নষ্ট করে মানুষ কঠের কারখানা তৈরি করেছে। প্রকৃতি মানুষের লোভের স্বীকার হয়েছে।মানুষের জৈব পরিবেশকে

ধ্বংস করার প্রয়াসকে অপু সামনে এনেছে । লক্ষণীয় এই যে ১৯৬২ - তে রাচেল কার্সন লিখেছেন 'সাইলেন্ট স্প্রিং' (Silent Spring) বা নীরব বসন্ত , যা আন্তর্জাতিক পরিবেশচেতনার অন্যতম গ্রন্থ বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু তার বহু আগেই পরিবেশের সমস্যা এ সংকটকে বিভূতিভূষণ অপুর মনোজগতে স্পষ্ট রূপ দিয়েছিলেন।

আরণ্যক:-

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে মূলত বঙ্গদেশের পটভূমিতে রচিত। 'অপরাজিত' উপন্যাসে পটভূমি আরও বিস্তৃত হয়েছে। কলকাতা নগরের সঙ্গে গ্রামজীবনের সরল প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বন্দ্বও প্রকাশিত হয়েছে। 'অপরাজিত'-র অপূর্বকুমার রায়ের ভ্রমণসূত্রে বহির্বঙ্গের প্রকৃতিও বর্ণিত হয়েছে। লক্ষনীয় বিষয়, অপূর্বর পরিবেশচেতনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনা ও ভারতীয় দর্শনচেতনার দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। 'আরণ্যক'- এর সত্যচরণকে নির্মাণ করার সময় এই চিন্তা বিভূতিভূষণের মনের মধ্যে ছিল। অপুর পরিবেশচেতনার অংশীদার তাই সত্যচরণও। এমনকী বহির্বঙ্গে প্রকৃতিকে দর্শন করে অপুর যে ধরনের ভাবনা প্রকাশ পায় যেন তার মধ্যে সত্যচরণের ভাবনার আভাস মেলে । নির্জন বনভূমিতে ঘোড়ায় চেপে বেড়ানো অপূর্ব ও

সত্যচরণের মধ্যে কাহিনি পরিকল্পনার মিল লক্ষণীয়। উভয়েই প্রকৃতির মুগ্ধতা ছাড়িয়ে যেন এই নির্জন বনভূমিতে পরিবেশচেতনায় ঋদ্ধ হয়েছে।

বঙ্গপ্রদেশে প্রকৃতির বুকে লালিত সত্যচরণ প্রথমে বিহারের প্রকৃতির প্রতি বিরূপ হলেও ফুলকিয়া বইহারের ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। যেমন— সে বসন্তকে উপলব্ধি করেছে অন্য রূপে। **"সেই বেগুনি জংলী ফুলগুলিই আমার কানে শুনাইয়া দিল আগমনবাণী। বাতাবীলেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনীফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। কতক্ষণ সেখানে একমনে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাংলাদেশের ছেলে আমি , কতকগুলি জংলী কাঁটার ফুল যে ডালি সাজাইয়া বসন্তের মান রাখিয়াছে, এ দৃশ্য আমার কাছে নূতন। কিন্তু কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙায় উপরকার অরণ্যের । কি ধ্যানস্তিমিত , উদাসীন , বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরাট।" —** সত্যচরণ প্রত্যক্ষ করেছে পৃথিবীর আদিম অরণ্যানী , নদী , পর্বত। পরিবেশভাবনার ক্ষেত্রে ওয়াইল্ডারনেস (Wilderness) বা অকর্ষিত জনবসতিহীন এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । ওয়াইল্ডারনেস বলতে বোঝানো হয়েছে প্রকৃতির সেই অংশ যা সভ্যতার দ্বারা কলুষিত হয়নি । আলোচকের ভাষায়- " The idea of wilderness, signifying nature in a state uncontaminated by civilization .. ' 'আরণ্যক ' - এ সত্যচরণ বন , পাহাড় , গিরিখাতের মধ্যে সভ্যতার যেখানে আঁচড় না পড়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতি বিরাজ করছে তার সঙ্গে সংযোগ অনুভব করেছে , অধ্যাতিকত্মার মধ্যে দিয়েও সে পরিবেশকে দেখেছে নুতন দৃষ্টিকোণে।

আবার ইতিহাসের সঙ্গেও পরিবেশকে একাত্ম করেছে। তার মনে হয়েছে আর্যরা যখন খাইবার গিরিপথ পার হয়ে পঞ্চনদে প্রবেশ করেছিল , তখন এ বন এই রকম ছিল, বুদ্ধদেব যেদিন তরুণী পত্নীকে ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন — এই গিরিচূড়া সেদিনও একইরকম ছিল,

এমনকী চন্দ্রগুপ্তের প্রথম সিংহাসন আরোহ, চৈতন্যদেবের শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন , পলাশীর যুদ্ধ হয় মহালিখারূপে ঐ শৈলচূড়া, বনানী ঠিক এমন ছিল। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, ভৌগোলিক ব্যাখ্যাতেও এই অকর্ষিত বসতিহীন এলাকাকে আবিষ্কার করেছে সত্যচরণ— **“ অতীত কোন দিনে , এই যেখানে বসিয়া আছি , এখানে ছিল মহাসমুদ্র— প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে — এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে । এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।"**

সত্যচরণ চেয়েছে আদিম অরণ্য সুরক্ষিত থাকুক। সেই জন্য সে যুগলপ্রসাদের সঙ্গী হয়ে সরস্বতী কুন্ডকে নানা রকম গাছে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এমনি ভবিতব্য যে তার হাতেই বনভূমি নষ্ট হয়েছে। সে মানুষ তথা প্রকৃতি সকলের সুখ দুঃখের সাথী হয়েছে। প্রকৃতি তার কাছে প্রকৃতিরানী হয়ে দেখা দিয়েছে, সে প্রকৃতির অভিমানও অনুভব করছে, আবার দাবানলের মত প্রকৃতির ভয়ঙ্কর বিরূপটাও প্রত্যক্ষ করেছে। প্রকৃতি প্রাণীর সমাহারে তার মনে হয়েছে-"এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন, উদ্দাম সৌন্দর্যময়ী আরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ। অন্য কোন দেশ হইলে আইন করিয়া এখানে ন্যাশনাল পার্ক করিয়া রাখিত।"—অর্থাৎ সত্যচরণ আরণ্যভূমি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে । ‘আরণ্যক’ শব্দটি যুগপৎ বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ। প্রথমটির অরণ্য সম্বন্ধীয়। দ্বিতীয়টির বেদান্তগত ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ। আবার অরণ্যবাসী মুনী প্রমুখ মানুষও বোঝায়। তবে আরণ্যককে সম্যক বুঝতে হলে দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা বিবেচ্য। এই অর্থ অনুযায়ী উপনিষদ - এর ব্যঞ্জনা সহজেই অনুভব করা যায়। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের কাহিনির অপূর্ব চিত্ররূপ। এই উপন্যাসের মধ্যে পাশ্চাত্য পরিবেশচেতনার ওয়াইল্ডারনেস এবং ভারতীয় ঔপনিষদিক পরিবেশচেতনা যেন একসূত্রে মিলে গিয়েছে।

ইছামতী:-

বিভূতিভূষণ তাঁর এই উপন্যাসে পরিবেশের ছত্রছায়ায় জীবনের এই সামগ্রিকতাবোধকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মানুষের জীবন পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সম্পৃক্ত। সূর্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না, হেমন্তের শিশির বর্ষণ, বাঁশঝাড়,লতা গুল্ম, প্রাচীন বট অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি বাড়া বৈঁচি ঝোপ , সবুজ চরভূমি , গাঙশালিখের গর্ত — সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়েই তৈরি হয় মানুষের জীবন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উপন্যাসটি লিখতে চেয়েছেন। ‘স্মৃতির রেখা ’ দিনলিপিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনিতে নেই, বরং কোনো শিশু মুগ্ধচোখে প্রথম পাখি দেখল তাও ইতিহাসের সামগ্রী। তাঁর ইতিহাস চেতনা ভিন্ন রকমের। তাঁর ভাবনাতে— **"এই যুগ যুগ ব্যাপী বিশাল মানবজাতি –শুধু তাও নয় — এই বিশাল জীবজগৎ — কোন্ মহা ঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরনো উপন্যাস।"** – উপন্যাসের মাধ্যমে ইতিহাসের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সামগ্রিক পরিবেশকেই ইতিহাসের তথা জীবনের মূল্যবান সামগ্রী বলতে চেয়েছেন। তারফলে 'ইছামতী' উপন্যাসটির ইতিহাসচেতনা পরিবেশচেতনারই ভিন্নতর রূপ হয়ে ওঠে।

গ্রাম্যসমাজের কৃষিনির্ভর জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রাম্য - পরিবেশ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।তবে পরিবেশ - চেতনাতে ঋদ্ধ চরিত্রের প্রয়োজনীয়তাতে চিত্রিত হয়েছে ভাবীন

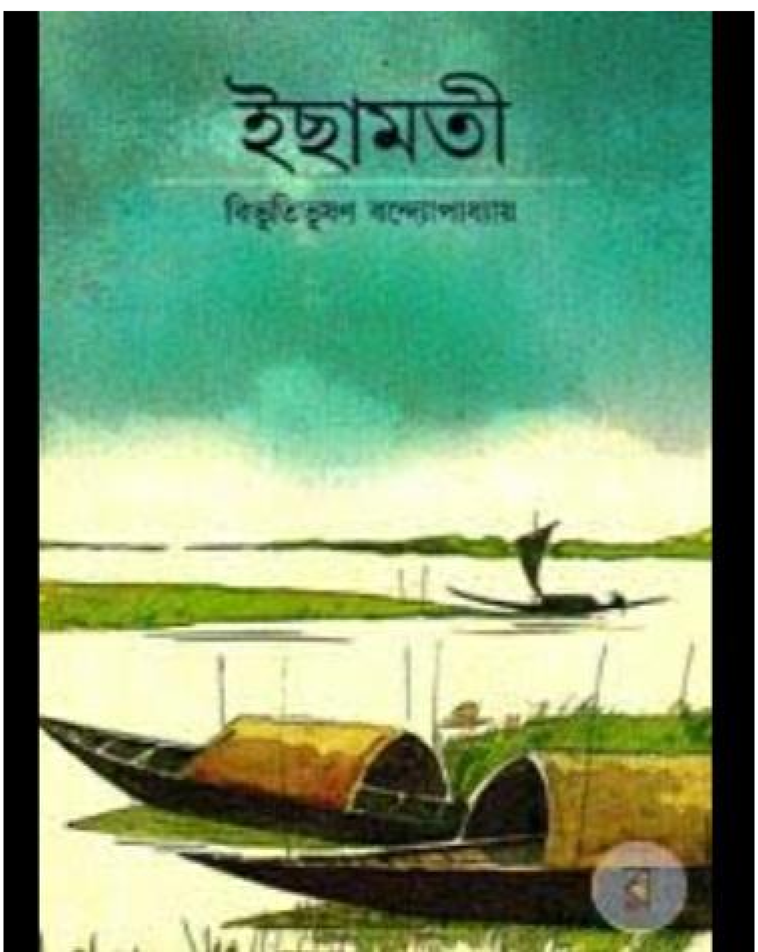

বাঁড়ুয্যে চরিত্রটি। প্রথম জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি সংসারী হয়েছেন। প্রথম জীবনের সন্ন্যাস তাঁকে পাঁচপোতা গ্রামের অন্যান্য মানুষ থেকে পৃথক করেছে এবংঔপনিষদিক ঐতিহ্য তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। ঔপনিষদীয় ভাবনার সঙ্গে তাঁর পরিবেশ ভাবনা মিলে প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন সৌন্দর্য।ভবানীর ব্যাখ্যায়— "প্রাচীন শাস্ত্র বেদ, যে বেদ প্রকৃতির গায়ে লেখা আছে আমার মনে হয় ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় ধর্মগ্রন্থ, এদের মধ্যে দিয়ে তাঁর লীলাবিভূতি দর্শন হয় বেশি করে। পাথরে গড়া মন্দিরে কি হবে, যার ভেতর তিনি নিজে থাকেন সেটাই তাঁর মন্দির। ওই চর পাড়ার বিলে আসবার সময় দেখলাম কুমুদ ফুল ফুটে আছে, ওটাই তাঁর মন্দির। বাইরের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতির তালে তালে চলে, তাকে ভালোবেসে সেই প্রকৃতিরই সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান শক্তির কাছে পৌঁছতে হবে।" – বিভূতিভূষণ এখানে প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা, প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন না, বলছেন বরং ভালোবাসার কথা। 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'-এর অপূর্বকুমার রায় এবং 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণ প্রকৃতি-পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত জীবন এবং প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন— দু-ধরনের জীবনই কাটিয়েছিল। কিন্তু ভবানী বাঁড়ুয্যের সেই বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে উপলব্ধি করেনি। প্রাচ্য ঐতিহ্যের বিচ্ছেদহীন পরিবেশ-সংক্রান্ত উপলব্ধি উনিশ শতকের পটভূমিতে অঙ্কিত ভবানীর চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনিমূলক রচনা যেমন ‘স্মৃতির রেখা’,‘তৃণাঙ্কর’ ইত্যাদিতে ইকোক্রিটিসিজম তথা পরিবেশ ভাবনার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ‘মৌরীফুল জাতীয় ছোটোগল্পে যেখানে গ্রাম্যবধূর দ্যোতনা বহন করে একটি ফুল; ফুটে ওঠে ইকো ফেমিনিজম এর রূপ।

<u>সহায়ক গ্রন্থ:-</u>

১.’বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা : রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ’ — কবিতা নন্দী

২.’পথের কবি’ — কিশলয় ঠাকুর

সম্ভাব্য প্রশ্ন:-

প্রশ্নের মান-১০

১.ইকোক্রিটিসিজম কাকে বলে? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে তা কীভাবে ফুটে উঠেছে লেখ।

২. অপূর্বকুমার রায়, সত্যচরণ, ভবানী বাঁড়ুয্যে — বিভূতিভূষণের পরিবেশ চেতনা ফুটিয়ে তোমার অনুঘটক মাত্র—আলোচনা করো।

প্রশ্নের মান-৫

১.‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে সবুজ সমালোচনার নানা দিক কিভাবে ফুটে উঠেছে লেখ।

২.‘ইছামতী’ উপন্যাসে সবুজ সমালোচনার নানা দিক কিভাবে ফুটে উঠেছে লেখ।

৩.‘আরণ্যক’ উপন্যাসে সবুজ সমালোচনার নানা দিক কিভাবে ফুটে উঠেছে লেখ।

৪. ‘ইছামতী’ ও ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে প্রকৃতি-পরিবেশ চেতনার সঙ্গে উপনিষদীয় ভাবনা কীভাবে যুক্ত হয়েছে তা আলোচনা করো